যায়যায়দিন

তারিখ 14-... 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

উচ্চশিক্ষার অপবাণিজ্য ঠেকাতে নতুন আইন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একটি বড় অংশ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় না। চাহিদা অনুসারে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং সেগুলোর আসন অনেক কম থাকায় এইচএসসি পরীক্ষার পরপরই ভর্তিযুদ্ধের অবতীর্ণ হতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। এ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কয়েক শতাংশ ছাত্রছাত্রী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার সুযোগ পায়। বাকি অংশের কেউ কেউ পরবর্তী বছরের জন্য প্রস্তুতি নেয়, কেউবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে ভর্তি হয়। এছাড়া অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ অনেক কম। সে তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ আকাশছোঁয়া। যাদের সামর্থ্য আছে তারা এ সুযোগ গ্রহণ করে।

হাতেগোনা দু-একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বাদ দিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পড়াশোনার মান ভালো। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত ভালো ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই ভর্তি হয়। এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকারাও দেশের সেরা।

তবে অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে। অনেক ভালো ছাত্রছাত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, কারণ এখানে সেশনজট থাকে না। তাই তারা অতিরিক্ত টাকার বোঝা বহনে দ্বিধাবোধ করে না। এছাড়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেশি উপার্জনের আশায় এখানে পড়ান। তাদের কেউ কেউ সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন, কেউবা খণ্ডকালীন কাজ করেন। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও এখানে পড়ান।

যেহেতু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা রাতারাতি বাড়ানো যাচ্ছে না, তাই ছাত্রছাত্রীদের চাহিদার দিকটি বিবেচনা করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনসেপ্টকে অবশ্যই ভালো বলতে হবে। এ রকম সুধারণা থেকেই বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯২ সালে। তখন 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২' নামে একটি আইন তৈরি হয়েছিল জাতীয় সংসদে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের এ মহান ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনার ভেজাল মিশ্রিত হয়ে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিয়েছে। ফলে ১৯৯৮ সালে এ আইনটির কিছু সংশোধনী আনা জরুরি হয়ে পড়ে।

কোনো একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করা হলেই এ অনিয়ম চোখে পড়বে। ক্যাম্পাসের ব্যাপ্তি, শিক্ষার মান, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, পঠিত বিষয় প্রভৃতি দিক খতিয়ে দেখলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাণিজ্যিক দিকটিই প্রাধান্য পায়, শিক্ষা নয়। এ রকম হতাশাজনক পরিস্থিতির পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছিল। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে চলমান অরাজকতা ও অপবাণিজ্য রোধ করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। তাই সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ, মেডিক্যাল অনুষদ নিষিদ্ধ, খণ্ডকালীন শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ব্যাংকে কমপক্ষে ২৫ কোটি টাকা এফডিআর করে রাখার মতো কঠিন শর্ত রাখা হয়েছে নতুন আইনে। আইনটি কার্যকর হলে উচ্চশিক্ষার নামে সনদ-বাণিজ্য বন্ধ হবে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে মালিক ও উদ্যোক্তাদেরই দেখা যাচ্ছে। এ আইনটি পাস হলে শিক্ষাবিদ ছাড়া আর কেউ উপাচার্য হতে পারবেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে আইনটিকে সময়োপযোগী বলতে হবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার ঘটুক- এটা সবাই চায়। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান যাতে বজায় থাকে সেটা নিশ্চিত করা সরকারের কাজ। শিক্ষা ক্ষেত্রে সনদ বাণিজ্য ও নৈরাজ্য ঠেকাতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার্যকর ভূমিকা রাখবে- এটাই সবার প্রত্যাশা।